লোকালের ভাষা, ভাষার রেলগাড়ি

রাহুল পণ্ডা

লোকালের সোশিওলেক্ট

আলোচনার গোড়াতেই একটি বিষয় পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত যে লোকাল ট্রেনে ব্যবহৃত ভাষা কোনো বিশেষ ভাষা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এমন কিছু গুপ্ত ভাষাগোষ্ঠী থাকে, যারা গোপনীয়তার স্বার্থে বিশেষ একধরনের কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে। বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অবস্থাতেই তারা তৈরি করে নিজস্ব পকেট, গড়ে তোলে সংকেতময় শব্দভাণ্ডার, বৈচিত্রময় সিলেবল এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক কায়দাকানুন। অনেক ক্ষেত্রে জীবিকার সঙ্গেও ভাষার এই সান্ধ্য ব্যবহার জড়িয়ে থাকে—মেদিনীপুরের পটুয়ারা, মন্দিরের পাণ্ডারা বা কলকাতার জেলে সম্প্রদায় নিছক ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই এই ধরনের ভাষার আচ্ছাদনে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে, গড়ে তোলে নিজেদের গোপন ভাষা। ট্রেনের দৈনন্দিন ভাষা কিন্তু এমন নয়, যারা নিত্যযাত্রী বা ফেরিওয়ালা, তারা কিছুক্ষেত্রে ইঙ্গিতময় শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করলেও, তার মধ্যে ব্যাপক কোনো গোপন ভাষা গড়ে তোলার প্রয়াস বা সদিচ্ছা কোনোটাই নেই। কিছু কিছু হাঁসজারু শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যায় বটে, যেমন—হেক্কড় (বদমেজাজি), কথাকলি মেসিন (ট্রেনে উঠেই যে যুগল অনর্গল কথা বলতে থাকে), ঠাণ্ডা-গরম (বৃদ্ধ বরের তরুণী বৌ), তাসসূয় যজ্ঞ (নিমগ্ন হয়ে ২৯ খেলা) উইকেট পড়া (সিটখালি হওয়া), ব্রেকিং নিউজ-ফলোআপ (পরিচিত কোনো নিত্যযাত্রীর বিয়ের খবর), বউদি (যৌনকর্মী) ইত্যাদি, কিন্তু তাদের সংখ্যা এত বেশি নয় যে আলাদা শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠতে পারে। ফলে যাকে তথাকথিতভাবে গোপন ভাষা বা জার্গন বলে, তা লোকাল ট্রেনের মধ্যে দেখা যায় না। তার বদলে যা ব্যবহার হয়, কিছু চলতি লব্জ যেগুলি নিত্যযাত্রীদের মুখে ক্রমাগত ফিরতে থাকে। শিয়ালদা হোক বা হাওড়া লাইন, খেয়াল করলেই দেখবেন কিছু তীক্ষ্ণ নির্দেশিকা সারাক্ষণই জনস্বার্থে নিক্ষেপিত হচ্ছে, যেমন 'চাপুন দাদা', 'বাম দিকটা ফাঁকা', 'চ্যানেলে ঢুকুন', 'কোমরের নীচটা খেলিয়ে নিন', 'গার্ড করবেন না', 'হাওয়া আসতে দিন', 'বারুইপুরে নামবেন তো এখনই গেটে কেন' ইত্যাদি। এইসব বিচিত্র বাক্যবন্ধ, এগুলো হয়ত বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সৃষ্টি

হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালের কালেকটিভ আনকনসাস এদের আপ্তবাক্যে পরিণত করেছে। কিন্তু এসবই ভাষার বাইরের দিক। লোকাল ট্রেনের ভাষার বিশিষ্টতা লুকিয়ে রয়েছে অন্য জায়গায়।

খেয়াল করলেই দেখবেন লোকাল ট্রেনে সাধারণ কথাবার্তার ব্যাপ্তি বিরাট। ইংরেজিতে ম্যাগনিচিউড শব্দটি দিয়ে যে ধরনের প্রকাণ্ড আয়োজনকে ইঙ্গিত করা হয়, লোকাল ট্রেনের বাক্যালাপ কার্যত কিছুটা তাই। লোকালে নিত্যদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের যাতায়াত। এই সমস্ত মানুষের শিকড়, ভাবনা, বেড়ে ওঠা, সাংস্কৃতিক রুচি, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি উপাদানগুলি এতোটাই একে অন্যের থেকে আলাদা যে কথাবার্তার উপর তার ছাপ পড়ে। ভাষাকে এই সমস্ত মানুষ নিজস্ব অভিপ্রায় অনুসারে বাঁকিয়েচুরিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে ব্যবহার করতে থাকেন। স্বভাবতই ভাষার এই নিয়ত আলাপের মধ্যে বিপুল বৈচিত্রের সম্ভাবনা তৈরি হয়, যাকে চট করে কোনো সাধারণ সংজ্ঞার খোপে ঢুকিয়ে দেওয়া শক্ত। তবে এই বিষয়ে সোশিওলিঙ্গুইস্টিকস বা সমাজভাষাবিজ্ঞানের কিছু তাত্ত্বিক ভাবনা আমাদের সাহায্য করতে পারে।

সমাজভাষাবিজ্ঞানে ভাষাকে সাধারণত খেয়াল করা হয় তিনটি ব্যবহারিক দিক থেকে। ভাষাবিজ্ঞানী হাইমসকে অনুসরণ করে এই তিনটি বিষয়কে আমরা কিছুটা এইভাবে সাজিয়ে নিতে পারি—সেন্ডার বা বক্তা, রিসিভার বা শ্রোতা এবং সেটিং বা উপলক্ষ্য। এখন মাথায় রাখতে হবে এই তিনটি বিষয়ের কোনোটিই একমাত্রিক নয়, সমাজভাষাবিজ্ঞানের পাঠে এদের প্রত্যেকেরই বহুমাত্রিক বিন্যাস সম্ভব। যেমন বক্তা বললে কোনো বিশেষ চেহারা বোঝায় না, খতিয়ে দেখার প্রয়োজন পড়ে তার আদত পরিচয়টি। তার লিঙ্গ পরিচয়, ধর্মীয় পরিচয়, জাতিগত অবস্থান, তার শিক্ষাদীক্ষা, বয়স, অর্থনৈতিক শ্রেণি, স্থানিক অবস্থান ইত্যাদি বিবিধ ফ্যাক্টর নিয়ে গড়ে ওঠে বক্তার স্যোশিওলেক্ট বা সামাজিক ভাষার ব্যবহার। বক্তার ক্ষেত্রে যেমন শ্রোতার ক্ষেত্রেও তেমনিই লিঙ্গ, বয়স, জাতি, ধর্ম, সম্পর্ক ইত্যাদি নির্ধারণ করে শ্রোতার পরিচয় এবং এই পরিচয়ই ঠিক করে তার সঙ্গে কীভাবে কথা বলা হবে। যেমন শিশুর সঙ্গে যেভাবে কথা বলা হয় শিক্ষকের সঙ্গে সেভাবে হয় না, রিক্সাচালকের সঙ্গে যেভাবে কথা বলা হয় বাবা-মার সঙ্গে সেভাবে হয় না—এইভাবেই শ্রোতার মানদণ্ড ভাষার ব্যবহারকে নির্দিস্ট করে দেয়। অন্যদিকে উপলক্ষ্য বলতে বোঝায় কী পরিস্থিতিতে, বা কোথায় ভাষাটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সভাসমিতি, স্কুল, সাংবাদিকতা, পথের ঝগড়া, ব্যাংকের ডামাডোল, অন্তিম যাত্রার মিছিল ইত্যাদি বিবিধ প্রেক্ষিত ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। উপলক্ষ্যের প্রয়োজনেই একজন বক্তা কখনো উপভাষা, কখনো দ্বিতীয় ভাষা, কখনো বা সম্ভ্রমহীন গালিগালাজ ব্যবহার করেন।

এখন যা গুরুত্বপূর্ণ; বক্ত-শ্রোতা এবং উপলক্ষ্যের এই যে ত্রিবিধ বিন্যাস এবং বৈচিত্র, প্রবাবিলিটির নিয়মে এর অগুনতি সম্ভাবনা সম্ভব। একজন বক্তা বিভিন্ন ধরনের শ্রোতার

সামনে পড়তে পারেন, একজন শ্রোতা বিভিন্ন বক্তার মুখোমুখি হতে পারেন, এবং পাল্লা দিয়ে পালটে যেতে পারে উপলক্ষ্যও। স্বভাবতই এতো ধরনের সম্ভাবনার সবকটিকে একসঙ্গে পাওয়া কার্যত অসম্ভব। এমনকি স্কুল, কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মিটিং মিছিলের মতো বৃহৎ জনসমাবেশেও বক্তা-শ্রোতা বা প্রেক্ষিতে বিপুল বৈচিত্র্য তৈরি হয় না। চাইলেই এদের অল্প কিছু খোপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া যায়। ফলে এমন আদর্শ পরিস্থিতি খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন যেখানে সব ধরনের বক্তা, সব ধরনের শ্রোতা, সব ধরনের উপলক্ষ্য হাজির থাকতে পারে। এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হল লোকাল ট্রেন। কেন? এর উত্তরে ভারতীয় রেলের সেই কালজয়ী বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে, 'এয়ার ইন্ডিয়া সারা বছর যে পরিমাণ যাত্রী বহন করে, রেল একদিনে তা করে থাকে।'[৩] এই অগুনতি মানুষ আকস্মিকভাবে এক জায়গায় জড়ো হন বলেই তাঁদের ভাষা ঘিরে বিবিধ সম্ভাবনা তৈরি হতে থাকে। ট্রেনে প্রেক্ষিতগত কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে সন্দেহ নেই, বিশেষত বিভিন্ন ধরনের ফর্মাল সিচুয়েশন—কলেজের গাম্ভীর্য, সেমিনারের স্থৈর্য্য, প্রাইভেট ফার্মে প্রেজেন্টেশনের নৈঃশব্দ ইত্যাদি পিনপতন গোমড়া আবহাওয়া ট্রেনে পাওয়া কঠিন, কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার জায়গাটুকু বাদ দিলে বক্তা-শ্রোতার বহুমাত্রিক চিহ্ন এবং স্তরগুলির সিংহভাগকেই শিয়ালদা বা হাওড়া সাবার্বনের যেকোনো লোকাল ট্রেনের যেকোনো কামরায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব। রেল বিশেষজ্ঞ প্রদোষ চৌধুরী যে কারণে উপযুক্ত মন্তব্য করেছেন—

> লোকাল ট্রেন ও তার যাত্রীরা হলেন ভারতবর্ষের বিবেক। এতে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, মূর্খ, বিদ্বান, ডাক্তার, চোর, পকেটমার, মাতাল, আইনজ্ঞ, শিল্পী, প্রেমিক, উদাস, ভণ্ড, বাউল ও ন্যাকা—সবাই মিলেমিশে যেন একটা ইউনিট। ... এত প্রাণ, এত কৌতূহল, উৎসাহ, ফ্রেটারনিটি পাওয়ার সম্ভাবনা অন্যত্র নেই।[৪]

নিত্যযাত্রীদের এই ব্যাপকতা এবং বহুমুখীনতা ভাষার উপর ছাপ ফেলে। শুধু তাই নয়, যে সুচতুর মার্জনায় একটি মান্য ভাষার ফ্রেমওয়ার্ককে প্রতিনিয়ত বৃহত্তর ভূখণ্ডের মানুষের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়, সেটিও কার্যত ভেঙে পড়ে ট্রেনের কামরায়। উপভাষার বৈচিত্র্য, শ্বাসাঘাতের ছন্দ, উচ্চকিত ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যবহার, বিশেষ আঞ্চলিক শব্দ ইত্যাদি সব মিলিয়ে ভাষার যে নিহিত ব্যঞ্জনা, ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়ের কথার যে স্বর ও স্বাতন্ত্র্য, তা সামনে আসতে থাকে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য এককালে ভাষা বিশিষ্টতা সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন—

> I saw the dialect changes every two miles, আমার যা experience আমি হয়তো একসঙ্গে পঞ্চাশ মাইল হেঁটে গেছি কার্যকারণে, Stop করে করে। দেখেছি অদ্ভুত, language changes every two miles .... মূল ভাষার একটা ঐক্য আছে কিন্তু tone আস্তে আস্তে change করে এবং তার অন্ততঃ intonation এবং তার emphasis ও syntaxগুলো এসে পড়ে।[৫]

দু'মাইল অন্তর পালটে যাওয়া ভাষার এই বহুগামিতা ফিল্ডওয়ার্ক বাদ দিলে একমাত্র ট্রেনের কামরাতেই পাওয়া যায়। যদি দীঘা লাইনের লোকালে কেউ নিয়মিত যাতায়াত করেন একটু সতর্ক হলেই তিনি দেখতে পাবেন কাঁথি, সজলপুর, রামনগর এবং দীঘা, তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে এই চারটে স্টেশনে যে সমস্ত মানুষ নেমে যাচ্ছে, তাদের মৌখিক ভাষা একরকম হয়েও আলাদা। যেমন—'কোথায় যাবেন?', এই প্রশ্নটি কাঁথিতে বলা হবে এই ভাবে, 'কুন্ঠি যাউট?', সজলপুরে হবে 'কৌইঠি যাউবো?', রামনগরে 'ক্যামা জিব?', এবং দীঘায় 'কুম্‌হা যাউচ?'। খেয়াল করুন এটা কিন্তু উপভাষার পার্থক্য নয়, রাঢ়ি, বরেন্দ্রি, ঝাড়খণ্ডির বৃহৎ এলাকাভিত্তিক তফাৎ নয়, বরং একই উপভাষার মধ্যেকার সাবসেটের তফাৎ—যা, ট্রেনের ঐ বিশেষ সেটিং ছাড়া নজরে আসা সম্ভব ছিল না। বাখতিনের পলিফোনের ধারণার সঙ্গে এই বৈচিত্র্যের খুব মিল আছে। দস্তয়ভস্কির উপন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে বাখতিন দেখিয়েছিলেন আখ্যান কাঠামোর মধ্যে চরিত্ররা কীভাবে নিজেদের স্বাধীন সত্তা এবং কণ্ঠস্বরকে বজায় রাখছে। বাখতিনের মন্তব্যটি এখানে তুলে দেওয়া যেতে পারে—

> 'A plurality of independent and unmerged voices and consciousnss .... with equal rights and each with its own world, combine but are not merged in the unity of the event.'[৬]

লোকাল ট্রেন কার্যত কণ্ঠস্বরের এই স্বাতন্ত্র্যকে ধারণ করে। ট্রেনের মধ্যে ধর্ম-জাতি-লিঙ্গ নির্বিশেষে এক ধরনের সাম্য বিরাজ করে বলেই সম্ভবত স্বরের এই আমিত্ব টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে।

লোকাল ট্রেনের ভাষ্যে এই বহুস্বর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, কিন্তু প্রায়শই গবেষকদের নজর এড়িয়ে যায়। তাই গোড়াতেই কিছুটা বিস্তারে এ দিকটি নিয়ে আলোচনা করা গেল। এরপরে লোকাল ট্রেনে ব্যবহৃত ভাষার অন্য কিছু চেনা দিক, যেমন নিত্যযাত্রীদের মধ্যে ব্যবহৃত হাস্যকৌতুক, কিছু আপাত অশ্লীল শব্দ, ফেরিওয়ালার ডাক ইত্যাদি নিয়ে খানিকটা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

রসিকতা

ট্রেনের রসিকতা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মার্গের বিষয়। যারা এরসঙ্গে পরিচিত তারাই জানে এই জিনিসের মার নেই। দম আটকানো ভিড়, পা ফেলার জায়গা নেই, দাঁড়ানোর স্বাচ্ছন্দ্য নেই, গলদঘর্ম কলেবর অথচ তার মধ্যে নিত্যযাত্রীদের মুখে ক্রমাগত খই ফুটতে থাকে; বিচিত্র পরিস্থিতিতে বিচিত্রতর চটুল মন্তব্য ট্রেনের আবহাওয়াকে এক ঝটকায় পালটে দেয়। রসিকতার পর্যায়ই যখন এলো রসসম্রাট শিবরাম চক্রবর্তীকে দিয়ে শুরু করা যাক। শিবরাম একবার বোনের বাড়ি যাবেন বলে স্টেশন এসে দেখেন এক বৃদ্ধা প্ল্যাটফর্মে বসে কাঁদছেন। প্রশ্ন করে জানলেন হঠাৎ করেই তার এসেছে মহিলার নাতি খুব অসুস্থ। এদিকে ট্রেনে একখানাও বার্থ ফাঁকা নেই। শিবরাম দয়াপরবশ হয়ে মহিলাকে

নিজের বার্থটি ছেড়ে দিয়ে মেসে ফিরে গেলেন। ফেরার পথে বোনকে স্মার্টলি ইংরেজিতে লিখে পাঠালেন, 'নট কামিং, গেভ বার্থ টু অ্যান ওল্ড ওম্যান।' পরের দিন সকাল না হতেই হুলুস্থুলু, বোন সপরিবারে কেঁদেকেটে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মেসে এসে হাজির। ব্যাপার কী? ঘটনা খুবই ভয়াবহ, শিবরাম তারে বার্থ বানান লিখে পাঠিয়েছেন 'birth'!

বার্থ সংক্রান্তই আর একটি মজার গল্প জোগাড় করেছিলেন প্রদোষ চৌধুরী, 'দার্জিলিং মেল ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই। কোচ এ-৪-এ এর সামনে একজন টিটি দাঁড়িয়ে। একজন হন্তদন্ত হয়ে এসে টিটিকে বলল, "টিটি সাহেব আমি খুব ঝামেলায় পড়েছি। আমার সঙ্গে আমার কম্পার্টমেন্টে চলুন, এক মহিলা আমার বার্থ কন্ট্রোল করে বসে আছেন।"[৭]

যদিও বার্থের সঙ্গে লোকাল ট্রেনের সে অর্থে যোগাযোগ নেই, তবু উল্লেখ করা গেল এটুকু বোঝাতে যে ট্রেনের জোকস মাত্রেই কনটেক্সটচুয়াল। নিত্যযাত্রীদের সরস অভিজ্ঞতা এবং ভোগান্তিই এদের বিশিষ্টতা দান করেছে। শুধু তাই নয় একই জোকসের বিবিধ রকমফেরও তৈরি হয়ে গেছে পরিস্থিতির ভিন্নতায়। ট্রেনে পা মাড়ানো নিয়েই যেমন একাধিক রসিকতা প্রচলিত

দাদা, বয়স কত আপনার?
এই পঞ্চান্ন রানিং।
মেঘে মেঘে বয়স তো অনেক হল, এবার একটু নিজের পায়ে দাঁড়ান।

বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারা তো? দাদা ওজন কত?
বিরানব্বই।
নেক্সটবার পা মাড়ানোর আগে নিজের ওজনটা খেয়াল রাখবেন।

দাদা, ব্যাগে চুনহলুদ আছে?
না।
তাহলে বুট পরে পা মাড়াচ্ছেন কেন?

এসবের পালটা জবাবও হয়,
দাদা পা মাড়িয়ে যাচ্ছেন, দেখতে পান না?
কী করে দেখব? পায়ের কি চোখ আছে? অদ্ভুত আক্কেল।

আরে নড়ছেন কেন থেকে থেকে?
কী করব স্যার। এখনও তো বেঁচে আছি, নড়াচড়া হবে না?
লোকাল ট্রেনে ভিড় লেগেই থাকে। কিছু কিছু পিক আওয়ারে সেই ভিড় কামরা

ছেড়ে বিপজ্জনকভাবে ঝুলতে তাকে ট্রেনের বাইরে। রেলের পোস্ট, ইলেকট্রিক খুঁটি, সিগন্যালের স্তম্ভ হুশ হুশ করে বেরিয়ে যায় গা ছুঁয়ে। সামান্য অসতর্কতাতেই শরীর ছিটকে যেতে পারে লাইনের সমান্তরাল খাঁজে। অথচ সেই অবস্থাতেও লঘু রসে ঘাটতি পড়ে না। যেমন,

দাদা একটু চাপুন না, বাইরে ঝুলছি তো।'

এর উত্তরে ভেতর থেকে কেউ না কেউ বলবেনই, 'শুধু ঝুললে হবে মাকে বলুন কমপ্ল্যান খাওয়াতে।'

ও দাদা ভেতরে ঢুকুন না। বাইরে ঝুলছে সব, পড়ে যাবে যে।

কিচ্ছু ভাববেন না। আপনারটাও তো ঝোলে, পড়ে যায় কি?

দাদা আমরা কি সরকারের ডিএ? ঝুলিয়ে রেখেছেন কেন? ভেতরে ঢুকতে দিন।

আবার এই জমজমাট ভিড়ে, যাঁরা হুক থেকে ঝোলেন বলে পোশাকি নাম বাদুড়ঝোলা, তাঁদের এই পক্ষী সগোত্র নিয়েও মজা কম হয় না।

বুঝলেন দাদা, আমাদের (ডেলি প্যাসেঞ্জার) আর বাদুড়ের মধ্যে একটাই তফাৎ—ঝোলার সময় বাদুড়ের ঠ্যাং উপরের দিকে থাকে।

কি বলব দাদা, বাড়িতে বৌ আজকাল এড়িয়ে যাচ্ছে। শুচ্ছে আলাদা ঘরে। বলে তোমরা সব ট্রেনে বাদুড়ঝোলা হয়ে যাতায়াত করো, কাছে এলেই নিপা হবে। ভাবুন আস্পর্ধা!

ভিড়ের ভেতরে প্রায়শই হাওয়া ঢোকে না। অনেকেরই শ্বাস নিতে সমস্যা হয়, তারা কোনোক্রমে হাঁসফাঁস করে জোরে প্রশ্বাস নিতে থাকেন। এ নিয়েও তৈরি হয়েছে উদ্ভট এবং কিছু ক্ষেত্রে আধা অমানবিক সব মজা—

দাদা জোরে শ্বাস নিচ্ছেন কেন? এইসব প্রাণায়াম বাড়িতে করবেন, এমনিতেই ট্রেনে হাওয়া কম।

কেন দাদা? অক্সিজেন কি রেশনে দিচ্ছে আজকাল?

দাদা জোরে শ্বাস নিচ্ছেন কেন? এমনিতেই ট্রেনে হাওয়া কম।

আপনার সমস্যা হলে নাইট্রোজেনে শিফট করুন না, কে আটকাচ্ছে?

এখানে নাইট্রোজেনের ইঙ্গিতটি কোন প্রেক্ষিতে তা বলার জন্য পুরস্কার নেই। আবার কিছু কিছু মানুষ থাকেন যারা নির্লিপ্ত মুখে ব্যস্ত মানুষের ব্রহ্মতালু জ্বালিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ধরেন। যেমন—

দাদা, এটা কী?

ট্রেন।

আরে কী ট্রেন?
ইলেকট্রিক ট্রেন।
ধ্যাত্তেরি যাবে কোথায়?
ড্রাইভার যেদিকে নিয়ে যাবে।

এর আর একটা ভিন্ন ভার্সান পাওয়া যায় সেটিও চমৎকার।
দাদা, শিয়ালদা?
না, হাঁসদা। শিয়ালের ভয়ে ভেতরে লুকিয়ে আছি।
অনেকেই জানেন না হাঁসদা একটি পদবী। সেটা এই শিয়ালদার প্রেক্ষিতে চমৎকার খাপ খেয়ে গেছে। আর একধরনের মজা হয় যার মাধ্যমে নিষ্পাপ হুমকি এবং ধর্মভীরু বাঙালির স্বরূপটি সামনে আসে। এই জোকসটি ডানকুনি লাইনে শোনা—

দাদা, ততক্ষণ থেকে গুঁতোচ্ছেন, একটু সামলে থাকুন।
কি বলছেন মশাই? আপনার থেকে এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছি, গুঁতোলাম কখন?
খবরদার মিথ্যে কথা বলবেন না, তাও বালির ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে। একদিকে দক্ষিণেশ্বর, একদিকে বেলুড়, পাপ আপনার বাপকেও ছাড়বে না।

কেউ কেউ দাবি করেন এর একটি ভার্সান হুগলি লাইনেও চলে। সেখানকার বয়ানটা কিছুটা এইরকম, 'বেলুড় স্টেশনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলছেন, সাহস তো কম নয়! স্বামীজী এক থাবড়ায় আপনাকে শিকাগো পাঠিয়ে দেবেন।' এর উত্তরে কেউ যদি মজা করে বলেন, 'ভালোই হবে তাহলে, শিকাগো মানেই তো আমেরিকার আরাম।' তাহলে প্রত্যুত্তর আসবেই সুমিষ্টি শ্লেষে 'জেনারেল নলেজে পড়েননি শিকাগো পৃথিবীর কসাইখানা?'[৮] থাপ্পড়ের সূত্রেই মনে পড়ে সেই বহুপ্রচলিত, বহু ব্যবহারে জীর্ণ রসিকতাটি—

আরে ধাক্কা মারছেন কেন? এতো তাড়াহুড়োর কী আছে? এক থাবড়ায় শিয়ালদা পাটিয়ে দেব।
একটু আস্তে মারবেন দাদা। আমি দমদমে নামব।

অনেক সময় শুধু একটি স্টেশনের নাম ঘিরেও বিভিন্ন মজার বাৎচিত চলে। যেমন বালি স্টেশনটি ঘিরেই একাধিক জোকস পাওয়া যায়,

দাদা, বালি ধরবে?
চিন্তা নেই, ভালো সিমেন্ট পেলেই ধরবে।

হানিমুনে কোথায় যাচ্ছিস?
বালি।
তাহলে টুক করে দক্ষিণেশ্বরটা ঘুরে নিস।
বলাবাহুল্য এখানে বালি বলতে ইন্দোনেশিয়ার বালি বোঝানো হয়েছিল।

অনেকসময় চমৎকার আঞ্চলিক বিশেষত্বও থাকে। ব্যান্ডেল-শ্রীরামপুর লাইনের ট্রেনে উচ্চগ্রামে ঝামেলা বা হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হলেই ধমক শোনা যায়, 'লজ্জা করে না, ট্রেনে মারামারি করছেন! ভুলে গেলেন এটা রোমান লাইন!' এক ধমকেই কাজ হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে, ঝামেলারত যাত্রীরা গুটিয়ে নেন নিজেদের। এখন এই ধমকানির পুরো মজাটাই লুকিয়ে রয়েছে রোমান-জার্মান তত্ত্বের মধ্যে। শিয়ালদা লাইনে প্যাসেঞ্জারদের সংখ্যা বেশি, স্বভাবতই মারমুখী মেজাজও খানিক চড়া, এই মার-মার-কাট-কাট হাট্টাকাট্টা মানসিকতা বোঝাতে এদের ডাকা হয় জার্মান বলে। অন্যদিকে হুগলী লাইনের প্যাসেঞ্জারদের দাবি তাঁদের রক্তে যেহেতু ফরাসি উপনিবেশের বনেদীয়ানা, তাই চরিত্রও খানিক সূক্ষ্ম। স্বভাবতই ঝগড়া-মারপিট-রেল রোকোর মতো গা-জোয়ারি কাজকর্ম তাঁরা এড়িয়ে চলেন। এই উন্নাসিকতা থেকেই নিজেদের ফরাসি বা রোমান ভাবতে পছন্দ করেন তাঁরা।

এভাবেই নিত্যযাত্রার ফাঁকে হাজারো মজার উপপাদ্য তৈরি হয়। সাধারণ মানুষের রস-উন্মুখ চিত্ত অহরহ খুঁজে বের করে কথার ফাঁক, আচরণের বৈসাদৃশ্য। আমরা আপাতত অল্প কিছু উদাহরণ দিয়ে কাজ সারলাম এখানে, পরিশ্রমী কোনো গবেষক নিশ্চিত এই তালিকাকে ভবিষ্যতে পূর্ণতা দেবেন।

ট্রেনের স্ল্যাং

বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্য প্রচুর সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশেষ কিছু প্রবণতার মধ্যে প্রগাঢ় অনৈক্য লক্ষ করা যায়—যার মধ্যে একটি হল তথাকথিত 'অশ্লীল শব্দ'-এর ব্যবহার। বাংলাদেশের মান্য মেইনস্ট্রিম সাহিত্যে, নাটকে, টিভির পর্দায় যে অনায়াস সাবলীলতার সঙ্গে স্ল্যাংকে জায়গা দেওয়া হয়, সে তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের রুচিসম্পন্ন পরিমণ্ডলে স্ল্যাং প্রায় অস্পৃশ্য। তথাকথিত প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখকরা কিছু ক্ষেত্রে লেখায় অকথা-কুকথা গুঁজে দেন বটে, কিন্তু তার মধ্যে দেখনদারির উগ্রতা যতটা স্পষ্ট, আত্তীকরণের প্রয়াস ততটা নয়। অথচ বিশেষ পরিবেশে বিশেষ বিশেষ স্ল্যাং-এর ব্যবহার যে ভাষাকে জীবন্ত করে তোলে, তা একরকম পরীক্ষিত সত্য। লোকাল ট্রেনে স্ল্যাং প্রসঙ্গের গোড়াতেই বাংলাদেশের কথা তোলা হল, কেননা বাংলাদেশ থেকে আগত অন্তত দু'টি অশ্লীল শ্লোগান এই মুহূর্তে কলকাতার দিকে লোকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়। অনেকেই হয়তো খবর রাখেন বাংলাদেশে কিছু মাস আগেই অভ্যুত্থান ঘটেছিল একটি

অভূতপূর্ব ছাত্র আন্দোলনের। সড়ক পরিষেবার অস্বচ্ছতা এবং দুর্ঘটনায় নিহত সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিষয়ে পরিবহণ মন্ত্রীর দায়িত্বজ্ঞানহীন কটাক্ষই ছিল ক্ষোভের কারণ। কিন্তু এই আন্দোলন যে কারণে তাৎপর্যপূর্ণ, তা হল শ্লোগানের ব্যবহার। ভাষাগত শ্লীল-অশ্লীল ভেদ সরিয়ে বিশেষ কিছু তীক্ষ্ণ বাকচাতুর্যের জন্ম হয়েছিল এই আন্দোলনে। সোশাল মিডিয়ার দাক্ষিণ্যে সেইসব শ্লোগান ছড়িয়ে পড়েছিল এপার বাংলার মানচিত্রেও। এর মধ্যে দুটি শ্লোগান লোকালের যাত্রীরা তুলে নিয়েছেন, যদিও কিছুটা নিজেদের মতো পালটে নিয়ে। প্রথমটি ছিল, 'আমার ভাইয়ের রক্ত লাল/পুলিশ কোন চ্যাটের বাল'। এখানে লোকালের ভাষায় পুলিশের জায়গা নিয়েছে কখনো সিআরপিএফ, কখনো টিকিট চেকার। মূলত গোষ্ঠীবদ্ধ বিনা টিকিটের যাত্রীদের মধ্যেই এই আস্ফালন সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। আর দ্বিতীয়টি ছিল, 'কমরেড—রাজনীতি মেধায় লাথি মারছে—রাজা আছে, নীতি নেই, নেতা চোদার টাইম নেই।' এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষিতে এখন লোকালে ব্যবহৃত হয়। সহযাত্রীর বামপন্থী রাজনীতির অতীত এবং বর্তমানকে ব্যঙ্গ করেই কার্যত এর অবতারণা। দুটি শ্লোগানেরই কানের কাছে দাবি চমৎকার, সেরকম নাটকীয় ভঙ্গিতে কোরাসে শুনলে আনমনা যাত্রীর মধ্যেও চমক তৈরি হয়।

আমরা ভূমিকায় দাবি করেছিলাম লোকালের কোনো গোপন ভাষা বা জার্গন হয় না। এই দাবি মিথ্যে নয়, কিন্তু লোকাল ট্রেনে মাঝে মাঝেই এমন কিছু আপাত-অশ্লীল শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যাদের অর্থের বীজ খুঁজতে গেলে সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্য উত্থাপিত হয়। এইসব শব্দ কার্যত বহুস্তরীয় অর্থের ধারণাকে বহন করে। দীক্ষিত গুণগ্রাহী ছাড়া সিংহভাগ মানুষই এসব বোঝেন না। কিছুক্ষেত্রে যদি বা উপরের অর্থটা বোঝেন খোসার আড়ালে কী ধরনের ইঙ্গিতময় রসবস্তু লুকনো আছে, তা ধরতে পারেন না। মূলত লোকাল বা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের দেওয়ালে, বাথরুমে, জানলার নীচে, সিটের উপরে দুরপনেয় মোটা কালির দাগে এইসব শব্দ লেখা হয়। টার্গেট থাকেন সাধারণ মানুষ থেকে ভ্রমণবিলাসী ট্যুরিস্ট সবাই। লেখার সঙ্গে দেওয়া থাকে বিশেষ ফোন নম্বর, যোগাযোগ করলে মেলে খাতিরদারির সুযোগ। ফিল্ড সার্ভে করতে গিয়ে এইরকম কিছু কিছু শব্দ আমরা খুঁজে পেয়েছি। তাদের একটা ধারাবাহিক তালিকা নীচে দেওয়া গেল।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া বা আসানসোলগামী ট্রেনে প্রায়শই পাওয়া যায় দুটি শব্দ চামু এবং চাম্। চামু অর্থ মদ বোঝায়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিদিশি লিকার থেকে মহুয়া ইত্যাদি বিভিন্ন মার্গের তরল। অন্যদিকে চাম্ বলতে তরুণী মেয়েদের বোঝানো হয়, যাদের ব্যবহার করা হয় দেহ ব্যবসার র‍্যাকেটে। ধ্বনিবিভ্রাটের কারণে চাম্ শব্দটি ছাম্ হিসেবেও ব্যবহৃত হয় কোথাও কোথাও। এখন চামু বা চাম্-এর অর্থ সুনির্দিষ্ট এমন নয়, এরা নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষেত্রেই জায়গা বদল করে, বা অনেক ক্ষেত্রে কেবল একটি শব্দ লেখা থাকলেই দ্বিতীয় শব্দটিও তার মধ্যে সংগুপ্ত থাকে। এখন সেই রকম অভিজ্ঞ চোখ হলে এক ঝলকেই এসব শব্দের অর্থ বুঝে ফেলা খুব কঠিন নয়।

নদিয়া লাইনের ট্রেনে আবার দেহোপজীবিনী অর্থে ব্যবহৃত হয় আচুক্কা শব্দটি। এমনিতে আচুক্কা খুব অপ্রচলিত শব্দ এমন নয়। নদিয়া-যশোরের কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত লোকসঙ্গীতে এর ব্যবহার আছে।[৯] মিহির সেনগুপ্তও তাঁর আত্মজীবনী 'বিষাদবৃক্ষ'-তে 'আচুক্কা' নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।[১০] আদতে শব্দটি বোঝাতো দেহসৌষ্ঠবে আকর্ষণীয় মহিলাদের, ইংরেজিতে যাদের সেক্সি বলা হয় তাদের। কিন্তু ট্রেনের ভাষায় আচুক্কার অর্থসংক্রম ঘটেছে, মূল অর্থের বিচ্যুতি ঘটিয়ে জমে গেছে আর এক স্তর পলি।

মেদিনীপুর লাইনের ট্রেনে, বিশেষত দীঘাগামী ট্রেনে পাওয়া যায় পার্টিকুলার দুটো শব্দ—বিয়া এবং ফন্ডা। দুটো শব্দের মূলেই পড়শি ওড়িয়া ভাষার বীজ। বিয়া বলতে বোঝায় নারীর যৌনাঙ্গ আর ফন্ডা (কোথাও কোথাও ফুনডো) বোঝায় তাসের ঠেককে। কিন্তু ট্রেনে ব্যবহারের সময় এই মূলগত অর্থ আর বজায় নেই। বিয়া বলতে আর নারীর যৌনাঙ্গকে বোঝায় না, সংশ্লিষ্ট ফোননম্বরে যোগাযোগ করলে জানা যায় তারা কার্যত সুলভে নারীমাংসের জোগান দেয়। সেইসঙ্গে অতিথি দেব ভবঃ—কৃত্য সাধনে রয়েছে ফুনডোর আয়োজন, অর্থাৎ নগদ অর্থের বিনিময়ে জুয়া খেলার আসর। সেরকম সুযোগ-সুবিধে মিললে চলে ক্রিকেট বেটিং-এর দরদামও।

এবার তিনটি প্রবাদের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।[১১] সব কটিই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ট্রেন থেকে সংগৃহীত এবং সবগুলিই কার্যত যৌনকর্মীদেরকে বোঝায়, কিন্তু সেই বোঝানোর মধ্যে একাধিক লেয়ার রয়েছে। একটি একটি করে বলা যাক—

'লা লষ্ট ঘাটে, মায়া লষ্ট হাটে' = অর্থাৎ ঘাটে নৌকো ফেলে রাখলে নৌকো যেমন নষ্ট হয়, তেমনিই বাড়ির বৌকে ঘর থেকে বেরোতে দিলে তার চরিত্র নষ্ট হয়। কিন্তু এখানে কেবল সেটুকুই বোঝানো হচ্ছে না। নিহিত অর্থটি হল গৃহবধূ যৌনকর্মীর যোগান রয়েছে।

'আদর দিলে মাগে, বুকের উপর হাগে' = খুবই পরিচিত প্রবাদ। স্ত্রীকে লাই দিলে সে মাথায় ওঠে। এখানে কিন্তু সেই লাই দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না, ইঙ্গিত করা হচ্ছে যৌনমিলনের বিশেষ ভঙ্গির দিকে। অর্থাৎ যে সমস্ত যৌনকর্মী পাওয়া যায় তাঁরা বিবিধ অ্যাক্রোবেটিক কামকলায় নিপুণ।

'কালে কালে কী দিন এলো, পোদের মেয়ে বামনি হলো' = এটি নির্দিষ্ট ভাবেই সুন্দরবন অঞ্চলের প্রবাদ। বামুনের বাড়িতে পোদের (পৌণ্ড্র জনজাতি) মেয়ে বৌ হিসেবে প্রবেশ করেছে, এই অনাসৃষ্টি ভাবাই যায় না। স্বভাবতই এই 'কুকীর্তি'-র পর বামনাইয়ের দেওয়াল ভেঙে চারদিকে গেল গেল রব। কিন্তু ট্রেনের কামরায় এর অর্থ আলাদা।

এখানে যৌনকর্মী হিসেবে ব্রাহ্মণের মেয়েকে বোঝানো হচ্ছে, এবং চাইলে যে পোদ সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে যেতে পারেন, এ তারই ইঙ্গিত।

খেয়াল করলে এই প্রবাদগুলি বা চামু, চাম্ আচুক্কা, বিয়া, ফুনডো এই শব্দগুলো খুব অপ্রচলিত এমন নয়। অশ্লীল শব্দ বা কুৎসার প্রবাদ হিসেবে এদের আঞ্চলিক ব্যবহার যেমন রয়েছে, তেমনিই ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের 'অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ'-এর মতো প্রতিষ্ঠিত অভিধানেও এদের কাউকে কাউকে পাওয়া যায়।[১২] অর্থাৎ একরকম মান্যতা এদের রয়েইছে। কিন্তু যা জরুরি, তা হল ভাষার ব্যবহারে অর্থের ভিন্নতা। এটা ঠিক সুযোগসন্ধানী মানুষ বেআইনি যৌনব্যবসার তাগিদে এই ভিন্নতাগুলো তৈরি করেছে, এইসব কাজকর্ম সবই আইনের চোখে অপরাধ, হয়ত হুমায়ুন আজাদ জানলে বলেই ফেলতেন্ 'আমি জানি সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে', কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে অন্তত এই প্রয়াসগুলোর কিছুটা হলেও মূল্য আছে।

ফেরিওয়ালা

> 'দত্তপুকুরের বাতের তেল, দত্তপুকুরের বাতের তেল—বাত, বেদনা, ফুলো, কাটা ঘা, পোড়া ঘা, দাঁত কনকনানি, এককথায় যত রকম ব্যথা, শূলনি, কামড়ানো আছে সব এক নিমেষে চলে যাবে—আজ চব্বিশ বছর এই লাইনে ওষুধটি প্রত্যেক ভদ্রলোক ব্যবহার করছেন, সকলেই এর গুণ জানেন।'[১৩]

উপরের এই চিৎকৃত ফেরির নমুনাটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ক্যানভাসা কৃষ্ণলাল' গল্পের অংশ। গল্পটি এমনিতে চমৎকার, কিন্তু যে কারণে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ তা হল এর মধ্যে ক্যানভাসার বা ফেরিওয়ালাদের ব্যবসায়িক প্যাটার্ন এবং সে প্যাটার্নে ভাষার বিশেষ ব্যবহার কী ধরনের কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, তা নিয়ে বেশ খানিকটা আলোচনা রয়েছে। গল্পের গোড়াতেই কৃষ্ণলালের চাকরি গিয়েছিল। চাকরি যাওয়ার পেছনে কারণ দু'টি। এক, আর্থিক নয়ছয়, দুই, তরুণ ক্যানভাসারদের ফেরির নিত্যনতুন কৌশল আয়ত্ত করতে কৃষ্ণলালের অনীহা। কৃষ্ণলাল মূলত ধ্রুপদী ক্যানভাসার। বাচনভঙ্গির কৌশল, পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ এবং অনর্গল বাকচাতুরীর ক্ষমতাই তার ব্যবসার ইউএসপি। কিন্তু তার তুলনায় নব্য যুবারা উপস্থাপনায় অনেকবেশি নাটকীয়। তারা থিয়েটারের রামের গলার অনুকরণ করে কামরায় বিচিত্র অভিনয়ের পালা অবতারণা করে, প্রয়োজনে হাত কেটে ফেলে সেই হাতে ওষুধ লাগিয়ে ওষুদের উপকারিতা বোঝায় ইত্যাদি। এই তারুণ্যের ঝাপটায় কৃষ্ণলাল প্রাথমিকভাবে বেসামাল হয়ে পড়লেও নিজের উপর বিশ্বাস হারায়নি, বরং সাবেকি পন্থাকেই সে বজায় রাখে। গল্পের শেষে দেখা যায় কৃষ্ণলালকেই লেখক জয়মাল্য দেন, কথা বলার শৈল্পিক আবেদন টেক্কা দেয় হাতকাটার থিয়েট্রিকসকে, পুনরায় স্বমহিমায় চাকরিতে ফেরে কৃষ্ণলাল।

এই গল্পটি থেকে কিছুটা বোঝা যায়, এমনি সাধারণ অভিজ্ঞতাতেও ধরা পড়ে ফেরিওয়ালার কাজ একটি পারফর্মিং আর্ট। স্বল্প সময়ের মধ্যে কামরার বিশৃঙ্খলার মধ্যে

দাঁড়িয়ে অমনোযোগী যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে নিজের পণ্যটি কেনার জন্য সম্মত করার মধ্যে যথেষ্ট মুনশিয়ানার দরকার পড়ে। অগভীর অভিনয় বা সস্তার সঙ সেজে ফেরির ভাবনা অল্প কিছুদিনই চলতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য অনেক বেশি সূক্ষ্মতার প্রয়োজন। সেজন্যই কথা বলার সময় ফেরিওয়ালাকে সতর্ক হতে হয়, দৃষ্টি আকর্ষণের উপায় ভাবতে হয়, এবং সতর্ক হতে হয় শব্দের ব্যবহারেও। কথার মধ্যে কোথায় জোর দিতে হবে, কোথায় পড়বে মধ্যম লয়ের যতি, কোথায় যোগ হবে দীর্ঘশ্বাস, কোথায় আসবে কণ্ঠস্বরের আকস্মিক উচ্চাবচতা, উচ্চারণের বিকৃতি বা প্রয়োজনে শব্দদ্বিত্ব—এগুলো রীতিমতো শিক্ষার বিষয়, সাধনারও বিষয়। এমন নয় যে এই সব ফেরিওয়ালারা নতুন কোনো শব্দভাণ্ডার তৈরি করেন। বরং প্রচলিত ভোকাবুলারিকে কাজে লাগিয়েই বিক্রিবাটার কৌশল রপ্ত করতে হয়, তাঁদের উপযুক্ত শ্রোতার জন্য খুঁজে নিতে হয় উপযুক্ত ভাষা এই ভাষার কিছু বিশিষ্ট দিক এরপর আমরা আলোচনা করতে পারি।

হুতোমের সেই বিখ্যাত ট্রেন যাত্রার বিবরণটি মনে করুন, 'হরকরা সার, হরকরা, 'ডেলিনু সার! ডেলিনুস!' কাগজ হাতে নেড়েরা ঘুচ্চে—লাবেল! ভাল লাবেল![১৪] বা 'টেক্ টেক্ নটেক্ নটেক্ অ্যাকবার তো সি।'[১৫] এই ভুল ইংরেজি, শব্দগঠনগত সমস্যা, ডেলি নিউজের বদলে ডেলিনুস বা নভেলের বদলে লাবেল উচ্চারণ ইত্যাদির মধ্যে ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও অনধিকারের দিকটি যেমন রয়েছে, তেমনিই মরিয়া একটা ভাষা দখলের চেষ্টাও যে আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তার থেকেও যা জরুরি, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটি বিদেশি ভাষার বাকরীতিকে নিজেদের সক্ষমতা এবং উচ্চারণবিধি অনুসারে গড়ে নেওয়ার প্রয়াস। বাঙালি বাবুরা উনিশ শতক থেকে ইংরেজি ভাষার বিশুদ্ধতা এবং ইয়র্কশায়ারের একসেন্ট আয়ত্ত করার জন্য যে নাছোড় লড়াই চালিয়ে গেছেন, ফেরিওয়ালা বা হকাররা সেই পথে এগোননি। তাঁরা নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী ইংরেজিকে গ্রহণ করেছেন এবং প্রয়োজনমতো বিকৃতি ঘটিয়েছেন। তাঁদের উচ্চারণে ডায়মন্ড হারবার হয়েছে ডামন হাবরা, কর্ড লাইন হয়েছে কট লাইন। প্লেন আমলকী হয়েছে পেলেন, ফ্রি হয়েছে ফিরি, সিগন্যাল হয়েছে সিঙ্গেল, অরিজিনাল হয়েছে অজ্জিনাল, পেন হয়ে প্যান, প্লাস্টিকের বাসন পেলাস্টিক, স্পাইসি ঝালবাদাম পাইসি ইত্যাদি। উচ্চারণগত অপারগতা এবং সেইসূত্রে দ্রোহের প্রয়াস এর মধ্যে স্পষ্ট। যদিও সময়ের পরিবর্তনে এবং বাজার অর্থনীতির দাপটে এই স্বকীয়তা ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একদিকে ব্যবসার প্রসার, অন্যদিকে কোম্পানি থেকে ফেরিওয়ালাদের নিয়মিত গ্রুমিং-এর দাক্ষিণ্যে উচ্চারণে 'ঔজ্জ্বল্য' এবং 'শুদ্ধতা' আসছে তাঁদের। লোকালের লাইনে ইদানিং তাই শোনা যাচ্ছে সুনির্দিষ্ট কিছু টার্ম—'বিজনেস মডেল', 'পাওয়ারফুল মেডিসিন', 'ফ্রেশনেস', 'অ্যাংজাইটি', 'অ্যামেজিং গেট আপ', 'এচিভমেন্ট', 'স্ট্রেস', 'অ্যাকিউরেট', 'উইক এন্ড', 'এভেলেবেল' ইত্যাদি। খেয়াল করলেই বোঝা যায় এগুলি সবই দূরদর্শন

এবং বিশ্বায়নের ভাষা, বৃহত্তর জনসংযোগের সম্ভাবনা মাথায় রেখেই মূলত এদের ব্যবহার করা হচ্ছে।

হকারদের ভাষার আর একটি দিক আঞ্চলিকতার ব্যবহার। কোন অঞ্চলে কী ধরনের ভাষা প্রচলিত বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কোন ভাষায় কথা বলেন, তা মাথায় রেখে হকারদের এগোতে হয়। যেমন ব্যারাকপুর, টিটাগড়, ডানকুনি, লিলুয়া, বালি, বেলুড় ইত্যাদি হিন্দিভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলে হকাররা অবমিশ্র হিন্দি বা বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেন। 'খাট্টা-মিঠা চানাচুর খান', 'পান খান, বানারস কা পান', 'এই যে দাদা, বড়িয়া পুতুল', 'শান্তিপুরের মসত্ গামছা' ইত্যাদি এই বিচিত্র প্রচেষ্টার অল্প কিছু উদাহরণ। ডানকুনি লাইনে গজা বিক্রেতা এক হকার তাঁর গজাটি যে নরম তা বোঝাতে 'মাসুম গজা' নামের মনোহর একটি শব্দবন্ধ তৈরি করেছিলেন, যা এখনও নিত্যযাত্রীদের মুখে মুখে ফেরে।

আবার বিভিন্ন ধরনের উপভাষার প্রয়োগও লক্ষ করা যায় কারুর কারুর মধ্যে। এর একটি চমৎকার উদাহরণ মেলে দীঘা-হাওড়া লাইনে। পূর্ব মেদিনীপুরের যে রুটে ট্রেনগুলি চলাফেরা করে তার একটা দীর্ঘ জায়গা জুড়ে ওড়িয়া ভাষার বিলক্ষণ প্রভাব রয়েছে। বস্তুত এখানকার ভাষা যতটা না বাংলা, তার থেকে অনেক বেশি ওড়িয়া। এখন এই রুটে দিনের বেলা যে ট্রেনগুলি চলে তাতে থাকেন কলকাতা ফেরত কর্মক্লান্ত স্থানীয় মানুষ। মজার বিষয় হল হকাররা দিনে এবং রাতে সম্পূর্ণ আলাদা দুটি ভাষায় ফেরি করেন। সকালে বলেন মান্য চলিত বাংলা, আর রাত গভীর হলে ফুটে ওঠে ওড়িয়া বুলি। একজন নির্দিষ্ট বিক্রেতার উদাহরণ দিই, ভদ্রলোক খেলনা বন্দুক বিক্রি করেন। সকাল বেলা বন্দুক বিক্রির যে ভূমিকাটি তিনি করেন, সেটি কিছুটা এইরকম—

> সাল ২০০৮। নন্দীগ্রামে তো গুলি চলল ঠাঁই ঠাঁই, মানুষ মরল শয়ে শয়ে, বডি ভেসে গেল খালের জলে, কিন্তু বন্দুকগুলো গেল কই? সেসব গোছানো ছিল পুরুষোত্তমপুরের টুনির মার কাছে। আমি খোঁজ পেয়ে গিয়ে হত্যে দিয়ে পড়লাম। বহু কাকুতি-মিনতির পর টুনির মাত্র ১৫টা বন্দুক দিয়েছে আমায়। সেইসব বন্দুক মাত্র একশো টাকায় দিচ্ছি আপনাদের।

আবার রাতে একই বয়ান চেহারা নেয় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ভাষ্যের—

> সনটা হউচি ২০০৮। নন্দীগ্রামর গুড়ি চললা ঠ্যায় ঠ্যায়কি, মড়ষ মরলা শ শ, বডি ভাসি গ্যলা খাঢ়র জঢ়র, কিন্তু বন্দুকগুড়া ক্যামা গ্যলা? সেইসব গোছাড়িয়া থিলা পুরুষোত্তমপুরর টুনির মার কতর। বহু কাকুতিমিনতি করার পরর টুনির মা মতে পনেরোটা বন্দুক দেইচি। সেইসব বন্দুক মাত্র শ টংকারো তিমম্যানকাকু দৌচি।

উপরোক্ত উদাহরণটি থেকে বোঝা যায় ব্যবসার প্রয়োজনে এবং প্রেক্ষিতের বদলে ভাষা কীভাবে চরিত্র পালটায়। আরও যা লক্ষণীয় এই উদাহরণে তা হল আখ্যানের ব্যবহার। একটি বিশেষ রাজনৈতিক ইতিহাসকে গল্পচ্ছলে মুড়ে দিয়ে প্রথমে একটি সমস্যা তৈরি করা হল (বন্দুকগুলো গেল কই?), তারপর তার একটি হাস্যকর সমাধান তুলে ধরা

হল খেলনা বন্দুক দেখিয়ে—আপাতদৃষ্টিতে এই ন্যারেটিভ একরৈখিক বলে মনে হলেও এর আড়ালে অনেকগুলি শেড আছে। রাজনৈতিক সন্ত্রাস, নির্বিচারে হত্যা, সশস্ত্র প্রতিরোধ, ধামাচাপা দেওয়া ইতিহাস এবং তার সঙ্গে 'টুনির মা'র মতো একটি জনপ্রিয় আর্বান ফেনোমেননকে সংলগ্ন করে দেওয়া, এসব সাধারণ চাতুরির কাজ নয়।

আখ্যানের প্রসঙ্গেই আসে ছড়ার ব্যবহার। ছড়া নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, দরকারও নেই, ফেরিওয়ালার ডাক এবং ছড়া নিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক চমৎকার গবেষণা হয়েছে,[১৬] আমরা কেবল দু'একটি বিশেষ উদাহরণ ছুঁয়ে যাব। খেয়াল করলে রেলের ছড়া মাত্রেই খুব ক্যাচি কিছু অন্ত্যমিলকে ব্যবহার করা হয়, যাতে ভিড়ের মধ্যেও প্যাসেঞ্জারদের দৃষ্টি আকষণ করা যায়। যেমন—ক্যানিং লাইনে এক পেয়ারা বিক্রেতা ঠেলঠুলে কোনোক্রমে কামরায় উঠেই হুংকার ছাড়েন, 'পেড়ে এনেছি/কেড়ে খান।' ঘুগনি বিক্রেতা আর এক হকারকে বর্ধমান লাইনে পাওয়া যায়, তাঁর উবাচ, 'প্রহ্লাদের ঘুগনি/খেতে কি মন হয়নি? এমনিতে লাগসই ছড়া, কিন্তু এখানে একটু টুইস্ট আছে। এই একই ছড়া মেদিনীপুর লাইনেও পাওয়া যায়, এবং সেখানেও একাধিক বিক্রেতা নিজেদের প্রহ্লাদ বলে দাবি করেন। বস্তুত প্রহ্লাদ ছিলেন একজন প্রবাদপ্রতিম ঘুগনি বিক্রেতা, বহুদিনই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু সেই কিংবদন্তীর নাম এখনও লোকস্মৃতিকে খুঁচিয়ে তোলার স্বার্থে ব্যবহার হয়ে চলেছে। একটি উপভাষাগত ছড়ার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। এটি ইঁদুরমারা বিষের ছড়া, বরিশাল থেকে আগত, শোনা যায় শিয়ালদা সাউথের ট্রেনে—ইঁদুর মরে কাড়া মরে/চিকা মরে ভাই/জাগায় জাগায়/রাইখ্যা দিবেন/ চিন্তার কারণ নাই।/ল্যাপ কাডে, ডোলা কাডে/তোষক কাডে/কাডে ইন্দুর ভাই/খাইয়া খাইয়া/মইর থাকবে/চিন্তার কারণ নাই।' এখন এই ছড়াটির বেশ কিছু শব্দ, যেমন—কাড়া, চিকা, ডোলা ইত্যাদি সাধারণ মানুষের কাছে অজ্ঞাত। তবু কেবলমাত্র বরিশাইল্যা অ্যাকসেন্টের জন্য ছড়াটির জনপ্রিয়তা খুব। আর একটি ছাড়ার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, ছড়াটি হুগলি লাইনে সুপ্রচলিত, পেন বিক্রির ছড়া—'লালু-ভুলু-কালু'/ অলটাইম চালু।' এখানে লালু-ভুলু-কালু যথাক্রমে লাল, নীল, আর কালো এই তিনটে রঙের পেনকে বোঝাচ্ছে। যেটা দেখার নীলের সঙ্গে ভুলুর কোনো যোগাযোগ নেই। অনেকে একটা কষ্টকল্পিত তত্ত্ব এইভাবে খাড়া করেন বটে যে নীল অর্থে ব্লু, সেই ব্লু থেকে বুলু, বুলু থেকে ভুলু। কিন্তু এটা যথেষ্ট সমর্থযোগ্য নয়। তেমন হলে বুলু বললেই চলত, তাতেও দিব্যি ধ্বনিসাম্য বজায় থাকত, ভুলু বলার দরকার ছিল না। আসলে এই শিকড় অন্য জায়গায়। বাঙালির পোষ্য নামকরণের যে ইতিহাস, তাতে এই তিনটি নাম এত সংলগ্ন যে তা আমাদের কালেকটিভ আনকনসাসের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। আর সেই সামূহিক নির্জ্ঞান থেকেই ছড়ার মধ্যে ভুলুর জায়গা করে নেওয়া। এই প্রসঙ্গে আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেখানে হকারের ডাক এবং পণ্যের মধ্যে প্রায়ই কোনো যোগাযোগ নেই। যেমন—'বুড়ির মাথায় পাকা চুল' বললে বোঝায় ক্যান্ডিফ্লস,

বা 'আদা আছে, জোয়ানের আরক আছে, গোলমরিচ অছে' বললে বোঝায় এমন একটি চকলেট যাতে এইসব উপাদান মজুত। অনেকে আয়ুর্বেদ ওষুধ বিক্রির সময় 'ব্যারাম' শব্দটিকে ভিত্তিহীনভাবে সমাস করেন, 'ব্যয় করে যে আরাম'—অর্থাৎ বিক্রেতার ওষুধটির পেছনে ব্যয় করে যে আরাম মেলে।

এভাবে শব্দার্থবিধিকে ভেঙে নিজেদের মতো সাজিয়ে নেওয়া, ভাষাকে চেনা চিহ্নের বাইরে নিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে বইয়ে দেওয়া, অর্থগত মাত্রাকে বহুস্তরে ভেঙে ফেলা ফেরিওয়ালাদের ডাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এবং শুধু এটুকুই নয়, এই ভিন্নতা ক্রমশ বৃহত্তর ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাকে আলাদা বৈচিত্র্য দান করে। গবেষক অর্ণব দত্ত এই বিষয়টি চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন,

> ... Hawkers create a whole novel world of words as well as semantic references for expressing their own off-beat and surprising 'creative exploits' to attract the consumers. This 'construction' cannot confine constricting itself within the semantic barriers of that very peddler. They become an integral, albeit a little hesitant part of the vast 'literary idioms' of that 'standard colloquial language.'[১৭]

শেষ কথা

কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ প্রায় চল্লিশ বছর আগে লিখেছিলেন 'ধাবমান ট্রেনের গল্প'। আদ্যন্ত বিষাদে জড়ানো কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু ছিল নিস্তব্ধতা। ট্রেনের কামরায় মুখোমুখি বসে একদা ঘনিষ্ঠ দুই প্রিয় মানুষ। দুজনের মধ্যেই জড়ো হয়ে আছে সুখস্মৃতির অতীত যাপন, অথচ অস্বস্তি সরিয়ে কেউ কথা বলছে না। কোথাও যেন নিবিড় নীরবতার নিষেধের তর্জনী চুপ করিয়ে রেখেছে সবকিছুকে। একঘেয়ে ট্রেনের ঝমঝম বাদ দিয়ে কামরায় কোনো শব্দ নেই। কবিতাটির কয়েকটা পঙ্‌ক্তি ছিল কিছুটা এই রকম--

> ধাবমান ট্রেন তার ছুটে চলা ধাতব জীবন
> আমাদের সবুজ কম্পার্টমেন্ট তবু শব্দহীনতা—মৃত্যুর মতো—
> যেন ফসল উঠে যাওয়া নিঃস্ব ক্ষেত—ভেঙেচুরে পড়ে আছে
> তার মাঝে শীতের বিষণ্ণ রোদ, নিরুত্তাপ—অসুখে মোড়ানো।...
> আমারা কি কোনোদিন আর কোনো কথা বলব না?
> এরকম পরস্পর মুখোমুখি বসে থেকে থেকে
> ছুটে চলা সময়ের ট্রেনে কোনোদিন আবার হবে না মুখরিত?[১৮]

কবিতাটি উল্লেখ করা গেল, কেননা এরসঙ্গে অদ্ভুত মিল রয়েছে বর্তমান লোকাল ট্রেনের। কবিতার মতোই ট্রেনও ক্রমশ নীরব হয়ে আসছে। মজার রসিকতা, রাগ, আক্রোশ, পায়ে পা তুলে ঝগড়া, পেছনে লাগার চটুলতা—গুটিয়ে যাচ্ছে সব। তবে সে নীরবতার কারণ সম্পর্কচ্যুত মানুষের ব্যক্তিগত অস্বস্তি নয়, বরং হাস্যকর হলেও সত্যি, কারণটি

মোবাইল ফোন। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে ফোন আর নিছক ফোন নয়, তা একই অঙ্গে টিভি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট সার্ফিং ইত্যাদি বিচিত্র গ্যাজেটের সম্মিলিত সংস্করণ, স্বভাবতই তার মোহিনী শক্তি বেড়ে গেছে বহুগুণ। ভিড়ে ঠাসা কামরাতেও নিত্যযাত্রীদের যাবতীয় আকর্ষণ চলে যাচ্ছে ফোনের দিকে। সহযাত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপের যে স্বাভাবিক ঐতিহ্য ছিল লোকালের রীতি, তা মুছে যাচ্ছে দ্রুত। স্বভাবতই সংলাপের এই বিস্মরণের যুগে ভাষা যে আর পূর্বের মহিমায় থিতু থাকতে পারবে না তা বলাই বাহুল্য। ফেরিওয়ালারা আফসোস করেন তাঁদের বিক্রিবাটা কমে যাচ্ছে, কেননা কানের পাশে হাঁক দিয়ে চিল্লালেও ফোনের স্ক্রিনে আটকে থাকা মানুষ ভ্রূক্ষেপ করছে না। কেউ কেউ আরও বেশি ব্যক্তিগত কুঠুরিতে ঢুকে পড়ার জন্য ব্যবহার করছেন হেডফোন। সোশ্যাল মিডিয়ায় অজস্র বন্ধু, অচেনা সম্পর্ক, হাজারো মেসেজ, অহরহ নোটিফিকেশন, যাদের অধিকাংশেরই বস্তুগত কোনো অস্তিত্ব নেই, তাতেই বাক্যহারা হয়ে মজে সিংহভাগ নিত্যযাত্রী। অথচ পাশে বসে থাকা রক্তমাংসের মানুষটির দিকে তাকাচ্ছে না কেউ। গায়ে গা ঘসেও ক্রমশ নেই হয়ে যাচ্ছে পারিপার্শ্ব। আর সেইসঙ্গে নেই হয়ে যাচ্ছে বুলি, ভাষাতত্ত্বের সংজ্ঞায় যাকে আমরা বলি আটারেন্স। এই বুলি না থাকলে ভাষার বিচিত্র সব বিশেষত্ব, যার কিছু কিছু বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করেছি, তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এবং সেই মৃত্যু ঘটবে এই অদ্ভুত নীরবতার মধ্যেই। স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার হুড়োহুড়ি থাকলে মাঝে মাঝেই উদাস দার্শনিক মন্তব্য ভেসে আসে, 'দাদা এতো ব্যস্ততার কী আছে, সবাইকেই তো একদিন যেতে হবে।' বস্তুত, সেই আবহমান শবযাত্রায় ট্রেনের মুখরতাও সামিল আজ। রুদ্র কবিতার শেষে প্রায় ঝাঁকুনি দিয়ে আহ্বান করেছিলেন, 'এসো কথা বোলে উঠি, আমরা ভালোবাসার কথা বলি;এই নিঃশব্দের দেওয়াল ভেঙে এসো আজ স্বপ্নের কথা বলি।'[১১] কিন্তু সে ঝাঁকুনিতে সাড়া দেওয়ার লোক প্রায় নেই বললেই চলে। তার চেয়ে অদ্ভুত এই আঁধারকে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। স্বীকার করে নেওয়া ভাল প্রায় মূক এক ভবিষ্যতের গহ্বরে, বা মৌনের কুয়োতলায় লোকাল ট্রেনের গুঞ্জন থমকে যাবে আচমকা, কবির ডাক ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে নৈঃশব্দের প্রতিধ্বনিতে।

তথ্যসূত্র এবং প্রাসঙ্গিক মন্তব্য :

১। পবিত্র সরকার, *ভাষা, দেশ, কাল*, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকতা, *মিত্র ও ঘোষ* পাবলিশাস প্রাঃ লিঃ, ১৪১৯, পৃ. ৬৭।

২। তদেব পৃ. ১৫৬

৩। ঋক্‌সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, *ট্রেনের আড্ডা : বাঙালির ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিসর*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, *সেতু প্রকাশনী*, ২০১৪, পৃ. ৯

৪। প্রদোষ চৌধুরী, *রেল কৌতুকী*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ. ১০৬

৫। মালবিকা মণ্ডল, *দেবী গর্জন : নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, *বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ*, ২০০৮, পৃ. ৬৭
৬। Jeremy Hawthorn, *A Glossary of Contemporary Literary theory*, 4th edition, Delhi (Indian edition), *Bloomsbury*, 2000, p. 266
৭। প্রদোষ চৌধুরীর পূর্বোক্ত বই, পৃ. ৬৩
৮। এই রসিকতাটির হদিশ আমায় দিয়েছেন হুগলী লাইনের দুঁদে নিত্যযাত্রী গবেষক সুদেব বসু।
৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর* (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, *পশ্চিমবঙ্গ লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ*, ১৩৭৪, পৃ. ১০৩৭
১০। মিহির সেনগুপ্ত, *বিষাদবৃক্ষ*, প্রথম সংস্করণ কলকাতা, *আনন্দ পাবলিশার্স*, ২০১৩, পৃ. ৪৮
১১। এই প্রবাদ তিনটির অর্থ আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বিনয় পাত্র।
১২। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, *অপরাধ জগতের ভাষা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩ পৃ। ৫৬
১৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রচনাবলী* (৭ম খণ্ড), চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, (*মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ*) ১৩৯৯, পৃ. ১৯৬
১৪। *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা*, সম্পা অরুণ নাগ, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, *আনন্দ পাবলিশার্স*, ২০১২, পৃ. ১৭২
১৫। তদেব, পৃ. ১৭৩
১৬। লোকাল ট্রেনের ফেরিওয়ালা নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা করেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দীপেশ প্রামাণিক। তাঁর গবেষণার কিছুটা অংশ পড়ে দেখা যেতে পারে *সর্বনাম* পত্রিকার (সম্পা: সুপ্রসন্ন কুণ্ডু এবং পঙ্কজ চক্রবর্তী) প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (জানুয়ারি ২০১৬) প্রকাশিত 'শিয়ালদহ মেনলাইনে ট্রেন হকারদের ভাষা' প্রবন্ধে।
১৭। Arnab Dutta, *Firiwalar Dak : A linguistic enquiry on the peddler's trade-cry in and around Kolkata*, cited in academia.edu [https://www.academia.edu/firiw$C4$/811%C4$81r_D4C481k_A_linguistic_enquiry-on_the_peddlers_trade-cry_in_and_around_Kolkata], 1/12/2018
১৮, ১৯। রুদ্র মউহম্মদ শহিদুল্লহ, *রচনা সমগ্র* (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, *বিদ্যা প্রকাশ*, ২০০৪, পৃ. ৫২